

আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ গায়ওয়ায়ে বদরে কুবরা- ইসলামের প্রথম ফায়সালাকারী যুদ্ধ (غَزْوَةُ بَدْرِ الْكُبْرَى أَوَّلُ مَعْرَكَةٍ مِنْ) (مُعَارِكِ الْإِسْلَامِ الْفَاصِلَةِ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

যুদ্ধ ক্ষেত্রে মক্কা সৈন্যদের আগমন এবং তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য (الْجَيْشُ الْمَكِّيُّ فِي عَرَصَةِ الْقِتَالِ، وَوُقُوعُ) (الْإِنْشِقَاقِ فِيهِ):

অপরপক্ষে কুরাইশরা উপত্যকার বাইরে দিকে তাদের শিবিরে রাত্রি যাপন করে। আর প্রত্যুষে পুরো বাহিনী সহ টিলা হতে অবতরণ করে বদরের দিকে রওয়ানা হয়। একটি দল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাউসের দিকে অগ্রসর হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘তাদেরকে ছেড়ে দাও।’ তাদের মধ্যে যেই পানি পান করেছিল সেই এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। শুধু হাকীম ইবনু হিয়ামের প্রাণ বেঁচেছিল। সে পরে মুসলিম হয়েছিল এবং পাকা মুসলিমই হয়েছিল। তার নিয়ম ছিল যে, যখন সে দৃঢ় শপথ করত তখন বলত ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আমাকে বদরের দিন হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

ওদিকে কুরাইশ সৈন্যদলে মহা কোলাহল শুরু হয়েছে। কেউ অহংকার ভরে চিৎকার করছে এবং কেউ ক্রোধভরে মাটিতে পদাঘাত করছে। এ সময় কুরাইশ দলপতির আদেশক্রমে উমায়ের ইবনু অহাব নামক এক ব্যক্তি মুসলিমদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য অশ্বরোহণে তাদের চারদিক প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। স্বদলে ফিরে এসে উমায়ের বলতে শুরু করে মুসলিমদের সংখ্যা কমবেশি তিনশ হবে এবং তাদের পশ্চাতে সাহায্য করারও কেউ নেই। তরবারী ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যে কোন উপকরণ তাদের সাথে নেই, এটাও আমি উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তারা এমন সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে যে, আমরা আমাদের একটি প্রাণের বিনিময় ছাড়া তাদের একটি প্রাণনাশ করতে পারবো না। কাজেই এ যুদ্ধে আমাদের পক্ষের অন্তত তিনশত প্রাণ উৎসর্গ না করে আমরা কোন ক্রমেই বিজয় লাভে সক্ষম হব না। যদি তারা আমাদের বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে হত্যা করে ফেলে তবে এর পরে বেঁচে থাকার সাধ আর কী থাকতে পারে? অতএব, আমাদের কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।’

উমায়েরের এ কথা শুনে যুদ্ধের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পকারী আবু জাহেলের সামনে আরেক সমস্যা দেখা দিল। লোকারো তাকে যুদ্ধ করা ছাড়াই মক্কায় ফিরে যেতে বললো। হাকীম ইবনু হিয়াম নামক কুরাইশ দলপতির চৈতন্যোদয় হল। তিনি দাঁড়িয়ে এক নীতি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং সকলকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এ অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার কোনই কারণ নেই, তিনশত প্রাণ বলি দিয়ে এ যুদ্ধে বিজয় লাভের সার্থকতাও কিছুই নেই। হাকীম বক্তৃতা দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি ‘উতবাহ ইবনু রাবীআহ নামক কুরাইশ দলপতির নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের মনোভবতার কাছে ব্যক্ত করলেন। ‘উতবাহ হাকীমের কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারল না। হাকীম তখন আশান্ত হয়ে বললেন, ‘দেখুন, আপনি ধনে মানে কুরাইশের একজন বরণ্য ব্যক্তি। সুতরাং আপনি একটু দৃঢ়তা অবলম্বন করে এ অন্যায় যুদ্ধ হতে স্বজাতিকে বিরত রাখুন, তাহলে আরবের ইতিহাসে আপনার নাম চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’ উতবাহ উত্তরে বলল, ‘আমি তো প্রস্তুত আছি। এক ‘আমর বিন হাযরামীর (যে

সারিয়ায়ে নাখলাহতে মারা গিয়েছিল) রক্তপণ, সেটাও আমি নিজে পরিশোধ করে দিতে পারি। কিন্তু হানযালিয়ার পুত্রকে (আবু জাহল) কোন যুক্তির দ্বারাই বিরত রাখা সম্ভব নয়। যাহোক, তুমি তার কাছে গিয়ে চেষ্টা করে দেখো, তোমার প্রস্তাবে আমার সম্মতি রয়েছে।’

তারপর ‘উতবাহ দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে লাগল। বলল, ‘হে কুরাইশগণ! তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর সঙ্গীদের সাথে যুদ্ধ করে কোন বাহাদুরী করবেনা। আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা তাঁদেরকে হত্যা করে ফেল তাহলে এমন চেহেরাসমূহ দেখতে পাওয়া যাবে যেগুলোকে দেখা পছন্দনীয় হবে না। কেননা এ যুদ্ধে হয় চাচাতো ভাই নিহত হবে নতুবা খালাতো ভাই কিংবা নিজের গোত্রেরই লোক নিহত হবে। সুতরাং ফিরে চল এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) ও গোটা আরব দুনিয়াকে ছেড়ে দাও। যদি আরবের অন্য লোকেরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করে ফেলে তাহলে তো সেটা তোমাদের কাজিত কাজই হবে। অন্যথা মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমাদেরকে শত্রুর দৃষ্টিতে দেখবেন যে, তোমরা তাঁর প্রতি তোমাদের করণীয় কাজটি করো নি।

এদিকে হাকীম আবু জাহলের নিকট হাযির হয়ে নিজের ও ‘উতবাহর মতামত ব্যক্ত করলেন। হাকীমের কথা শুনে আবু জাহলের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সে ক্রোধান্বিত স্বরে বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের দেখার পর ‘মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যাদু ‘উতবাহর উপর বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। কক্ষনো না, আল্লাহর শপথ! আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না। না, না এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, ‘উতবাহর পুত্র মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দলভুক্ত (‘উতবাহর পুত্র আবু হুযাইফা (রাঃ) প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং হিজরত করে মদীনায়ে গিয়েছিলেন)। সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত। তার নিহত হওয়ার আশঙ্কায় নরাধম এমন বিচলিত হয়ে পড়েছে। ধিক্ শত ধিক্ তাকে।’

হাকীম তখন আবু জাহলকে সেখানে রেখে ‘উতবাহর নিকট গমন করে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। ক্রোধ, অভিমান ও অহংকারে ‘উতবাহ একেবারে আতমবিস্মৃত হয়ে পড়লো। সে বলে উঠল, কী, আমি ভীৰু? আমি কাপুরুষ? পুত্রের মায়ায় আমি বীরধর্মে জলাঞ্জলি দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আরববাসী দেখুক, জগদ্বাসী দেখুক যে, কে বীর পুরুষ, আমি ততক্ষণ ফিরব না যতক্ষণ না মুহাম্মাদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়। এ বলে সে সদল বলে সমরাস্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলল। আর ওদিকে আবু জাহল ছুটে গিয়ে ‘আমির ইবনু হযরামীকে বলল, ‘দেখছ কি, তোমার ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ আর সম্ভব হবে না। কাপুরুষ ‘উতবাহ সদল বলে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। শীঘ্র উঠে আত্ননাদ করতে শুরু কর।’

আবু জাহলের কথা শেষ হতে না হতেই ‘আমির তার সকল অঙ্গে ধুলো বালি মাখতে মাখতে এবং গায়ের কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিহত ভ্রাতার নাম নিয়ে আত্ননাদ করে বেড়াতে লাগল। আর যায় কোথায়, মুহূর্তের মধ্যে হাকীমের সমস্ত পরিশ্রম পশু হয়ে গেল। ক্ষণিকের মধ্যেই রণ পিপাসু মুশরিক বাহিনীর বীভৎস চিংকার দিগ্বিদিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলল এবং রণাঙ্গন প্রকম্পিত হয়ে উঠল।